বাসস্থানের অধিকারকেন্দ্রিক ন্যায়ের জন্য একটি নতুন ভাষা?

সুস্মিতা পতি

৩ জুলাই, ২০২৩

ভারতের বিষয়ে খবর অনুসরণ করলে, কেউই সম্ভবত অবিরত ধ্বংসের খবরগুলি লক্ষ্য না করে পারবেন না। এই ধ্বংসকাজের গতি বৃদ্ধি পায় ২০২২ সালে, যখন থেকে রাষ্ট্র এই পন্থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের "ন্যায়"-এর ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহার করছে। উত্তর প্রদেশে এই পন্থা একটি বিশেষ রূপ নিলেও, দিল্লী, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামে একই উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। একদিকে "বেআইনী নির্মাণ"-এর অভিযোগকে মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবহার করা হচ্ছে তাঁদের আরও অধিকারচ্যুত করতে। অন্যদিকে, যে রকম বেপরোয়া গতিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে, তা নগরের গাছপালা ও নাগরিক দরিদ্র শ্রেণী, উভয়কেই বিপদে ফেলছে।

কিন্তু, আমরা জানি যে এই ধংসের কাজ নরেন্দ্র মোদীর আমলে শুরু হয় নি। যবে থেকে আধুনিক নগর পরিকল্পনার চিন্তা শুরু হয়েছে, তবে থেকে, যাকেই কদাকার বলে ধরা হয়েছে বা যা নগর পরিকল্পকের আঁকা সুবিন্যস্ত ছবির সঙ্গে মেলে নি, তাকেই ধ্বংস করা হয়েছে। প্যারিসে ব্যারন হাউসমান থেকে শুরু করে দিল্লীর জগমোহন – সব সময়ই "পরিকল্পনা"-র ছাঁচে নগরকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা তার পথে ফেলে এসেছে মৃত্যু ও বিনাশ।

বসবাসের প্রশ্নটি ভারতে কেন এত সামান্য গুরুত্ব পায়? জাহাঙ্গিরপুরীতে ঘটা এই ধরনের ধ্বংসের কাজের প্রথম উদাহরণটিকে একটি সাম্প্রদায়িকতা প্ররোচিত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়, এবং তা নাগরিক সমাজকে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু, বেশ কিছু মাস চলে যাওয়ার পরেও আমরা এই ধ্বংসকাজ প্রশমিত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখতে পাই না। দিল্লীর তুঘলকাবাদ আর আসামের শোণিতপুরের বাসিন্দারা এই মুহূর্তে এই ধ্বংসের ফলাফল ভোগ করছেন। যে শ্রমিকশ্রেণী আজ উৎখাতের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা আর শুধুমাত্র দরিদ্র মুসলিম গোষ্ঠীর সদস্য নন। গত বছর এই ধ্বংসকে কেন্দ্র করে যে জনরোষের বিস্ফোরণ হয়েছিল, ধ্বংসকাজের উপর যত আকর্ষণ বেড়েছে, সেই জনরোষ ততই প্রশমিত ও নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। এমনকি, অতিমারীর কারণে লকডাউনের সময় আমরা যে শত সহস্র পরিযায়ী শ্রমিককে হাজার হাজার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে তাঁদের গ্রামে ফিরতে দেখেছি, তা শুধুমাত্র ভয়াবহই নয়, একই সঙ্গে বিভ্রান্তিকরও ছিল। যখন আমেরিকার শহর শহরে বাড়িভাড়া বাতিল করার জন্য প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, চাকরি হারানোর ধাক্কায়, এই মারাত্মক সময়েও তাঁদের বাড়িভাড়া বাতিলের জন্য খুব বেশী গলা তোলেন নি। নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে অ্যাক্টিভিস্ট ও শিক্ষাবিদ পর্যন্ত, সকলেই পুনর্বাসন ও কল্যাণমূলক সাহায্যের জন্য দাবি জানানো ছাড়া সামান্যই বক্তব্য রেখেছেন।

এর মানে এই নয় যে, বসতবাড়ির অধিকার নিয়ে কাজ করেন যে অ্যাক্টিভিস্টরা, তাঁদের প্রচেষ্টাকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, বরং যে কঠিন অবস্থায় তাঁদের কাজ করতে হয়, তাকেই স্বীকার করা হচ্ছে। ভারতে বসতির অধিকারকে একটি সাংবিধানিক অধিকার বলে কখনওই স্বীকার করা হয় নি (ন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর হাউসিং রাইটস নিশানের নিচে একত্রিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার দ্বারা ১৯৮০-র দশকে যে কর্মসূচী খসড়া তৈরির অপচেষ্টাটি সত্ত্বেও)। আদালতগুলিও বসবাসের অধিকারের জন্য স্পষ্ট করে কোনও বক্তব্য রাখার প্রতি অনুকূল নয়। এই আক্রমণ যত বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, জনগণকে সংগঠিত করা ততই কঠিন হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রই আর ক্ষমতার একমাত্র পরিসর থাকে না। বসবাসের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি ভারতে একটি

রাজনৈতিক প্রশ্নে অনূদিত হতে ঐতিহাসিকভাবে অক্ষম হয়েছে। অথচ ফ্রান্সে ১৯৬৮ সালের প্যারিস আন্দোলনের তীব্র যন্ত্রণাময় সময়ে ফরাসি দার্শনিক হেনরি লেফেব্রে যে "নগরের উপর অধিকার" -এর কথা বলেন, তা সারা পৃথিবীর নাগরিক আন্দোলনের রণধ্বনি হয়ে উঠেছিল এবং তা এই "অধিকার"-এর আকার, স্থানীয় প্রেক্ষিত অনুযায়ী কি হবে, তা ঠিক করার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে, "নগরের পর অধিকার" পরিকাঠামোটিকে অনথিভুক্ত শ্রমিকদের জন্য সাশ্রয়ী বাসস্থান, অধিকার এবং আরও অনেক কিছুর দাবি জানানর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ইউএন হ্যাবিট্যাট এবং অ্যাকশান এইড-এর মত সংস্থাগুলির হাত ধরে ভারতীয় প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হওয়ার পর "নগরের উপর অধিকার" এবং, ফলত, বাসস্থানের উপর অধিকার বিষয়টি দক্ষতা ও দায়িত্ব, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, স্বতন্ত্র একটি অধিকারের ভাষার মধ্যে সুসম্বদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই পার্থক্যের ঐতিহাসিক শিকড় কোথায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০-এর দশক থেকেই নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল বসবাসের প্রশ্নটি, কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি বাসস্থানের অধিকারকে একটি রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করত না। বসবাসের প্রশ্নটি শ্রম ও জাতির কেন্দ্রে থাকলেও শ্রম ও জাতি আন্দোলনগুলি শ্রমজীবিদের বসবাসের জায়গাগুলিকে কেবলমাত্র আন্দোলনের "পরিসর" হিসেবে দেখেছে, "বিষয়" হিসেবে বিবেচনা করে নি। ১৯৭০-এর দশকের বিক্ষিপ্ত কিছু মুহূর্ত, যখন শ্রমিক আন্দোলন ও দলিত আন্দোলন - দুইই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বসবাসের প্রশ্নটির উপর মনোযোগ দিয়েছিল, সেগুলি বাদ দিলে, আবাসনের প্রশ্নটি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রান্তিকই রয়ে গেছে। তাই, সামাজিক আন্দোলনগুলির হাতেও এই প্রশ্নটি অবহেলিতই রয়ে গেছে। ১৯৯০-এর দশকের অনেকটাই চলে যাওয়ার পর, যখন সামাজিক ন্যায়ের মঞ্চে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি প্রবেশ করে রাজনৈতিক চিত্রটিকে বদলে দিয়েছে, একমাত্র তখনই এই বসতির প্রশ্নটি ভারতে প্রবেশ করে। "সকলের জন্য বাসস্থানের অধিকার"-এর কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাবের কারণে, বাসস্থানের প্রশ্নটি শুধুমাত্র নীতির প্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে, যেখানে এটি এমন আরেকটি সরকারী বিষয়ে পরিণত হয়েছে যাকে সংখ্যার মাধ্যমে মাপা যায় আর নকশার উপর ছকে দেওয়া যায়। "নাগরিক দরিদ্র" পরিচয়ের কোনও রকম স্পষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো না থাকায়, তাঁরা দারিদ্র-পীড়িত একটি অচিহ্নিত, অস্পষ্ট সত্ত্বা হিসেবেই থেকে যান। এই দিকটিও ভারতের আবাসনের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক করে তুলতে খুব একটা সাহায্য করে না।

এই নীতি-নিয়ন্ত্রিত, সরকারী বিবৃতিটি মূলত এসেছে, যাকে অকুপ্যান্সি আরবানিজম অথবা অটোকনস্ট্রাকশান বলে বোঝান হয়, তার থেকে। এই অবস্থানটি বলে যে, দরিদ্র শ্রেণী সব সময়ই নাগরিক পরিকল্পনা ও নীতি, দুইয়েরই উর্ধ্বে জীবনযাপন করে এসেছেন, যেখানে তাঁরা নিজেদের থাকার জন্য আরও বেশী সংখ্যক বাড়ি বানিয়েছেন। সেগুলিকে অবৈধ বলে বিবেচনা করলেও, এই নিঃশব্দে স্থান দখলের বিষয়টি শুধুমাত্র প্রতিরোধের একটি রূপই নয়, আমাদের শহর ও নগরে বসবাসের একমাত্র ব্যবহারিক সমাধান। দরিদ্র শ্রেণীর জন্য পর্যাপ্ত, উপযুক্ত ও সাশ্রয়ী বাসস্থানের সমাধানকে যে রাষ্ট্র আদৌ সম্বোধন করবে, সেই অসম্ভাব্যতার কথা মাথায় রেখেই বলা যায় যে, বস্তি এলাকাকে পুনর্নির্মাণ না করে, রাষ্ট্রের উচিত তাকে নিয়ন্ত্রণ ও তার উন্নয়নের চেষ্টা করা।

বাসস্থানের অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন অনেক অ্যাক্টিভিস্টই বহু বছর ধরে এই অকাট্য যুক্তিটিকে ধরে রেখেছেন। যদিও, এই যুক্তিটিকে নীতির সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হয়েছে, কিন্তু এই পদক্ষেপটিকে একমাত্র সমাধান হিসেবে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু যে ধরনের ভয়াবহ বাস্তুচ্যুতি আমরা এখন ঘটতে দেখছি, তার সামনে বসবাসের অধিকার নিয়ে একটি জোরাল রাজনৈতিক ভাষার অনুপস্থিতি বিষয়টিকে আরও শক্তিহীন করে তোলে। এই আইনগুলির বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি এবং তার বদলে দুর্বল আবেদন ও প্রধানত নতি স্বীকার করে নেওয়ার যে অবস্থান নেওয়া হয়েছে তা আদতে কোনও স্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষার অনুপস্থিতিরই প্রতিফলন। শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ একটি কার্যকর কৌশল হলেও, যে অবস্থাতে দেশের ও রাজধানীতে ঘটে চলা হিংসা একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, সেখানে এই ধরনের গঠনমূলক, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কোনও রকম তীব্র

সমালোচনার নির্মাণ করে না। একটি গভীর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়া এই ধ্বংসকাজ বা লকডাউনকে অধিকারের উল্লঙ্ঘন হিসেবে সুসম্বদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করার কোনও উপায় নেই।

রাষ্ট্র যেরকম বিশেষভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, তার ফলে, গত দুই দশক ধরে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপর্যয় এসেছে। নারীবাদী আন্দোলন সহ অন্যান্য অনেক অন্দোলনই এখন এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে, যখন আন্দোলনকারীরা আইন ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আবার চিন্তা করতে শুরু করেছেন। এই মুহূর্তে সব চেয়ে গুরুতর কাজটি হল, একটি ইন্টারসেকশানাল ভাষার নির্মাণ, যা ন্যায়ের একটি অর্থবহ ভাষাকে কেন্দ্র করে এমন একটি প্রতিবিতর্ক তৈরি করবে যা শ্রম, শ্রেণী, জাতি, লিঙ্গ ও আরও বিবিধ অবস্থানের উদ্বেগকে একত্রিত করবে। এই দিক থেকে দেখলে, বসবাসের অধিকারের জন্য রাজনৈতিকভাবে সুসম্বদ্ধ একটি দাবি সংখ্যালঘু শ্রেণীর বিরুদ্ধে হিংসা ও সাংগঠনিক হিংসার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সরব হতে এবং শ্রমের অধিকার ও লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত ন্যায়ের মত বিষয়কে সামনে তুলে ধরতে সক্ষম। বসবাসের অধিকার তাই এমন একটি পরিসর ও ভাষা নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে, যা এই মুহূর্তে ভারতের সামাজিক আন্দোলনের জন্য খুবই জরুরী। এই পরিসর ও ভাষাই হয়ত এই বিশেষ মুহূর্তে একটি নতুন রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে সঞ্জীবিত করতে পারবে।

সুস্মিতা পতি ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল ল স্কুল অফ ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক।